

বাংলাদেশের ডোম সমাজ

আবদুস সান্তার

বর্ণভেদ প্রথা অনুযায়ী ডোমরা হল সবচেয়ে ‘নিচু জাত’-এর একটি। দলিতদেরও দলিত তারা। যুগ যুগ ধরে তারা মনুষ্যজাতির মধ্যে ‘অভিশপ্ত’ হয়েই বেঁচে আছে। যদিও সামাজিকভাবে নাপিত, ধোপা, জেলেরাও দক্ষিণ এশিয়ায় দলিত; কিন্তু ডোমরা তাদের কাছেও অস্পৃশ্য। অনেক স্থানেই এখনও কোন ডোমের ছেলেকে নাপিতের কাছে চুল কাটতে নিয়ে যাওয়া হলে নাপিত ‘অস্পৃশ্য’ জাত বলে চুল কাটতে গড়িমসি করে, তাড়িয়ে দেয়। ধোপারাও তাদের কাপড়চোপড় রাখে না, ‘অচ্ছূত’ বলে। তাদের নিয়েই অনুসন্ধানী লেখা।

অজিত গুহকে নিয়ে লেখা ‘কাকা বাবুর টয় হাউজ’ গ্রন্থে দিনু বিলাহ লিখেছেন, “সেই শৈশবে দেখা, ওরা (মেথররা) যার যার নিজের জলপাত্র হিসেবে কোমরের সাথে আংটাওয়াল্লা একটা মগ সব সময় বেঁধে রাখতো। যখন জলপান বা চা পান করতে চাইতো তখন সেই মগটা বের করে দিতো। দোকানী বেশ ওপর থেকে সেই মগে চা অথবা জল ঢেলে দিতো যেন মগের সাথে কেটলি বা জগের কোনো স্পর্শ না ঘটে। দোকানের বাইরে কালো একটা মটকায় আলাদা করে ওদের জন্য জল রাখা হতো।” প্রশ্ন হল, একেবারেই কি উঠে গেছে এসব দৃশ্যকল্প?

ঢাকার বাইরে কোন কোন জেলায় এখনও খাবার হোটেলগুলোতে তাদের ঢুকতে দেয়া হয় না। তারা এখন কোমরের সাথে আংটাওয়াল্লা মগ বেঁধে রাখে না ঠিকই, কিন্তু চা দোকানে বা হোটেলে গিয়ে কিছু খেতে চাইলে দোকানের বাইরে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দোকানদার আলাদা গ্লাসে বা ডিব্বায় জল বা চা দিয়ে থাকে। অথচ তাদের সাথের বাঙালি পরিচ্ছন্নতাকর্মী দোকানে বসে পান করতে বা খাবার খেতে কোন সমস্যা হচ্ছে না।

‘জাতপাত’ বিষয়টা বা বর্ণভেদ প্রথা হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বেশি সম্পর্কিত। এই অমানবিক জাতপাত ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ কোন কালে কোন স্থান থেকে যে হয়েছে তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারবে না। তবে ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ১০০ থেকে ২০০ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের উদ্ভব। এই ব্রাহ্মণ্যবাদই মনুর অনুশাসন বলে জাতপাত ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে চালু করেছিল। পরবর্তীকালে বন্থাল সেন এই বর্ণবাদী বা জাতপাত ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দেন।

ডোম উপবর্ণ

ডোম, ডোমার, মঘাইয়া ডোম—এইভাবে বিভক্ত এই সমাজ। মূলত পেশা ও ভাষার ওপর ভিত্তি করে এই বিভক্তি করা হলেও বাংলাদেশে সর্বস্তরে এরা সবাই ঝাড়ুদার শ্রেণিরই মানুষ এবং বাংলা ভাষায়ই কথা বলে। ঐতিহাসিকভাবে ডোমদের মূল পেশা ছিল হাসপাতালগুলোতে লাশকাটা ঘরে ডাক্তারদের সহযোগিতা করা এবং লাশের সৎকার করা। তবে এখন ঝাড়ু দেয়ার কাজও করে থাকে তারা। হাসপাতালগুলোতে দিন দিন ডোমদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। নতুন চাকরিও হচ্ছে না। ডোমদের মতই ডোমাররাও পুরোপুরি ঝাড়ুদার শ্রেণি। আর মঘাইয়া ডোমরা পূর্বে কিছুটা ভবঘুরে প্রকৃতির ছিল; এখন তা পাল্টাচ্ছে।

পেশা

আজকের ডোমদের ভাষ্য মতে, আদিকালে ডোমদের পূর্বপুরুষরা বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, কুলা, খাঁচি, ঝাড়ু ইত্যাদি তৈরি করত। আবার কেউ কেউ শিকার করত। কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মাঝিমাঝার কাজও করত।

নবাবি আমলে ডোমদের ভারতের পাটনা থেকে আনা হয় এই দেশে জল্লাদের কাজ ও মৃতদেহ সৎকারের জন্য। তখন থেকে ব্রিটিশ সরকারের আমল পর্যন্ত প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের বেতনভুক কর্মচারীদের মধ্যে জল্লাদ ছিল। তাদের কাজ ছিল মৃত্যুদণ্ডদেশ কার্যকর করা। জল্লাদ তার আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় এই কাজটি করত।

হিন্দু ধর্ম মতে, হিন্দুদের মৃতদেহ শ্মশানে নেয়ার সময় ডোমদের স্পর্শ থাকতে হবে। তাহলে সৎকার শুদ্ধ হয়। এ জন্যই প্রতিটি শ্মশানঘাটে ডোমদের উপস্থিতি বেশি। অন্যদিকে হিন্দুদের কোন জমায়েতে একজন ডোম থাকলেও সবাই হয়ে যায় অপবিত্র। কিন্তু তাদের মৃতদেহের অস্ত্যস্তিক্রিয়ায় শত শত ডোম উপস্থিত থাকলেও অপবিত্র হয় না।

ডোমরা মনে করে, ব্রিটিশ সরকার অনেকটা জোরপূর্বক ডোমদের মেথরের কাজে নিয়োগ করে। ১৮৭১ সালে আদমশুমারি রিপোর্টে ঝাড়ুদার শ্রেণির লোক হিসেবে ডোম, ডোমার, মঘাইয়া ডোম, হেলা, বাঁশফোঁড়, হাঁড়ি, লালবেগী ও রাউতদের ‘মেথর’ নামে অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক সূত্র বলছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য—ওড়িশা, অন্ধপ্রদেশ, বিহার ও অযোধ্যা থেকে এসব দলিত শ্রেণির লোকদের নিয়ে এসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োগ করা হয়। সরকার তাদের জন্য বিনা টাকায় মদও সরবরাহ করত, যাতে তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে নোংরা সরানোর কাজটি সহজে করে।

তখন থেকে মদ খাওয়া ডোমদের অভ্যাস এবং মদ খাওয়ার অভ্যাসটি তাদের মধ্যে পুরোপুরি রপ্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ধীরে ধীরে বিনা টাকায় মদ সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে তারা টাকা দিয়ে মদ খেতে থাকে এবং বলা যায়, এই মদই তাদের সর্বনাশ করেছে। আর্থিক ক্ষতি, স্বাস্থ্যের ক্ষতির পাশাপাশি সামাজিকভাবে মান-মর্যাদারও সর্বনাশ হয়েছে এভাবে। বর্তমানে এসব দিক বিবেচনা করে অনেকেই মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বয়স্কদের মধ্যে কেউ কেউ মদ খেলেও নবীনদের ৫ শতাংশও মদ খায় না।

ডোম সমাজ উন্নয়ন কমিটির লোকেরা বলেন, রেওয়াজ অনুযায়ী ডোম সম্প্রদায়ের বয়স্ক লোকেরা মদ খেয়ে থাকলেও অতি মাত্রায় কিছু করে না। এদের খাওয়ার জন্য মদের উৎপাদন ও বেচাবিক্রি হয়। তবে বাইরের লোকেরাও মদ খেতে আসে এবং মদের ব্যবসার সাথে তারা জড়িত। প্রভাবশালীদের সহযোগিতা ছাড়া এই ব্যবসা চলে না এবং তারা বখরা নেয়। ফাঁকে দিয়ে মেথরদের বদনাম হয়।

সব শ্রেণির ডোমরাই বংশপরম্পরায় এই কাজটি করে আসছে। তখন মেথরদের যে অমানবিক নোংরা কাজটি করত হত, বর্তমানে তো তেমন নোংরা কাজ নেই, অর্থাৎ তখন আজকের মত এরূপ স্যানিটেশন ব্যবস্থা ছিল না। তখন টয়লেট বা বাথরুম ছিল অধিকাংশ কাঁচা। অগতীর গর্তের মধ্যে। কয়েক দিন পর পর মেথররা তা পরিষ্কার না করলে ওই টয়লেটের দুর্গন্ধে থাকা যেত না এবং টয়লেটগুলো

ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেত। তখনকার মেথর ও বর্তমানের পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সাথে এটা একটা বড় পার্থক্য। তখন মেথরদের মাথায় অথবা কাঁধে করে ময়লার বুড়ি নিয়ে যেতে হত। বর্তমানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে, টয়লেট কয়েক বালতি পানি ঢেলে দিয়ে ঝাড়ু দিয়ে একটু খোঁচা দিলেই পরিষ্কার। অনেক ক্ষেত্রে ঝাড়ু দেয়ারও দরকার হয় না। ব্রিটিশ পাউন্ডার ছিটিয়ে দিয়ে পানি ছিটিয়ে দিয়ে ঝাড়ু দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই ব্রিটিশ বা পাকিস্তান আমলে বাঙালিরা মেথর বা সুইপারদের ঘৃণা করলেও বর্তমানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে বাঙালি মুসলমানরাই ৬০ শতাংশ।

কর্মসংস্থানের সংকট

একদিকে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধিত চাপ, অন্যদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে বাঙালি মুসলমানদের নিয়োগ— এই দুটি কারণে তাদের চাকরিবাকরি পেতে সমস্যা হচ্ছে। ব্রিটিশ বা পাকিস্তান সরকারের আমলেও এসব পদে শতভাগ লোকবল নিয়োগ তাদের থেকে করা হত। তখন বাঙালিদের নিয়োগ কল্পনারও উর্ধ্ব ছিল।

ডোম সমাজ উন্নয়ন কমিটির অর্থ বিষয়ক সম্পাদক নয়ন লাল ডোম থাকেন গোপীবাগ রেলওয়ে কলোনিতে। তিনি হিসাব করে বলেন, গোপীবাগের ওই কলোনিতে ২১টি ডোম পরিবার থাকে। এর মধ্যে ৬ জন সরকারি চাকরি করে। ১০ জনের মত ঢাকা সিটি করপোরেশনে (উত্তর ও দক্ষিণ) চাকরি করে।

২১টি পরিবারে কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ৬৫। বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠানে, গার্মেন্টেস ও মিল-কারখানায়, দোকানপাটে এবং বাসাবাড়িতে কাজ করে ৩০ জন। বাকি ১৯ জনই বেকার। এই বেকারদের মধ্যে তাঁর ছেলে একজন এবং ভাগ্নি একজনও বেকার। তারা তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর স্ত্রী কমলাপুর রেলওয়েতে সরকারি চাকরি করেন এবং তিনি টিআইসিটিতে মাস্টাররোলে চাকরি করেন। হরিজন ঐক্য পরিষদের নেতারা (সভাপতি ও সম্পাদক) বলেন, আগের চেয়ে বর্তমানে তাদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়লেও শিক্ষার যোগ্যতানুযায়ী তাদের চাকরিবাকরি হচ্ছে না। সরকারি চাকরি তো সোনার হরিণ, সুইপার পদেও চাকরির জন্য ৪-৫ লাখ টাকা ঘুম লাগে। তাদের সেই টাকাও নেই, চাকরিও হয় না। অন্যদিকে শিক্ষা যোগ্যতা থাকলেও নিচু বর্ণের (জাত) বলে চাকরি হয় না। নাগরিক সনদপত্রে চাকরি নিয়োগকর্তা দেখে যে চাকরিপ্রার্থী ডোম বা পেশার দিক দিয়ে মেথর জনগোষ্ঠীর, তাহলে বিভিন্ন অজুহাতে তাদের বাদ দেয়া হয়। এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার মত পুঁজিও তাদের নেই।

সমস্যা

তাঁরা বলেন, বিভিন্ন বেসরকারি অফিসে ও প্রতিষ্ঠানে বেতন অনেক কম দেয়া হয়। ৫-৭ হাজার টাকা, বড়জোর ৮ হাজার টাকা। গার্মেন্টেস ও মিল-কারখানায় ৫-৬ হাজার টাকা মাসিক মজুরি দেয়া হয়। ওভার টাইমসহ ৭-৮ হাজার টাকা পাওয়া যায়। বিভিন্ন অফিসে তাদের স্ত্রী ও মেয়েলোকেরা ধোয়ামোছার কাজ করে থাকে, এতে ৫ হাজার টাকার বেশি মজুরি দেয়া হয় না। বিভিন্ন বাসাবাড়িতে ঝাড়ু দেয়া, সিঁড়িতে ঝাড়ু দেয়া ও ধোয়ামোছার কাজ করলে ৩-৪ হাজার টাকা মজুরি দেয়। মালিক ভাল হলে ৫ হাজার টাকা মজুরি দেয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, নারী ও পুরুষের মজুরির ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য বিরাজ করছে। সমাজ

কাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীদের মাসিক মজুরি ৩-৪ হাজার টাকা কম দেয়। অনেকগুলো পৌরসভায় ৫ হাজার টাকারও কম মজুরি দেয়া হয়।

ঢাকা সিটি করপোরেশনে যাঁরা দৈনিক মজুরিভিত্তিক কাজ করেন তাঁদের দৈনিক মজুরি ২৬৫ টাকা ঝাড়ু দেয়ার জন্য, ২৮৫ টাকা বাড়িতে ময়লা তোলা ও নামানোর জন্য। এছাড়া যাঁরা ১৫-২০ বছর বা তারও বেশি বছর চাকরি করেন তাঁদের ক্যাঙ্কুয়েল শ্রমিক হিসেবে ধরা হয়েছে, তাদের বেতন ১৪ থেকে ১৬ হাজার টাকা। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে খুব কম লোকই এই মজুরি পায়। ১৯৮২ সালে পার্মানেন্ট করার কথা বলে হরিজন জনগোষ্ঠীর বহু লোককে ছাঁটাই করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাদের থেকে খুব কম লোকই নিয়োগ করা হয়। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃক দৈনিক মজুরিভিত্তিক লোক নিয়োগ করা হবে বলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি ও এসএসসি উল্লেখ্য চাওয়া হয়। কিন্তু কোন পদে নিয়োগ দেয়া হবে, মজুরী কত তা জানানো হয়নি। তাদের লোকজন জানেও না যে সিটি করপোরেশন লোক নিয়োগ করবে, অথচ নিয়ম অনুযায়ী ও নীতিগতভাবে এসব চাকরি তাদেরই প্রাপ্য।

তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুইজনে চাকরি করে দৈনিক ১৫-১৬ হাজার টাকা আয় করেন। আবার কোন কোন পরিবারে একজনই আয় করে থাকে। কারণ স্ত্রী যদি অশুভসত্তা হয় অথবা ঘরে ছোট বাচ্চা থাকে তাহলে বা অসুস্থ হলে তাঁর পক্ষে আয় করা সম্ভব নয়। তখন একজনের আয়-রোজগার দিয়ে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাতদিন ১৮-১৯ ঘণ্টা অমানবিক পরিশ্রম করেন অনেকেই। রাত ৩টার সময় রাস্তায় ঝাড়ু দেয়ার কাজ করেন। সকাল ৯-১০টায় বাসায় ফিরে গোসল করে নাকে-মুখে চারটা ভাত বা রুটি গুঁজে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজে বের হয়ে পড়েন অনেকেই। এর মধ্যে বিশ্রাম বা ঘুম কত ঘণ্টা হয়? ৫-৬ ঘণ্টা।

১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা গঠিত হয়। তখন ঢাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বভার পড়ে পৌরসভার ওপর। সেই থেকে ঢাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বেশ কিছু মেথর নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠিত হলে ঢাকাকে এই নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয়। তখন এই নবগঠিত রাজধানী ঢাকাকে অধিকতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ভারতের বিহার, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর থেকে আরও বেশি সংখ্যক মেথর নিয়ে এসে নিযুক্ত করা হয়।

ঢাকা পৌরসভাকে ঢাকা সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় এবং বর্তমানে এই সিটি করপোরেশনকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর। এদিকে আগের সেই মেথরদেরও নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলা হচ্ছে। মেথর শব্দটি শুনতে কেমন যেন অমর্যাদার ভাব ছিল। তাই পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলাটা সর্বজনগৃহীত। তাছাড়াও তখন মেথর বলতে ডোম, ডোমার, মঘাইয়া ডোম, হেলা, বাঁশফোঁড়, লালবেগী, রাউত, বাল্লীকি, তেলেগুদের বোঝানো হত। বর্তমানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে বাঙালি মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি। তাই শব্দগতভাবেই শুধু নয়, গঠনগতভাবেও মেথর ও

পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মধ্যে পার্থক্য আছে।

যা হোক, সেই ১৯৬৪ সাল থেকে এরা বংশানুক্রমে সিটি করপোরেশনে চাকরি করে এলেও আজ পর্যন্ত তাদের স্থায়ী পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। শ্রম আইন অনুযায়ী এটা নিয়োগবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সরকারের নাকের ডগায় বসে ঢাকা সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলো সরকারেরই প্রণীত শ্রম আইন লঙ্ঘন করে আসছে।

স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হলে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার পাওয়ার কথা, যেমন— সার্ভিস ভাতা, অবসর ভাতা, সার্ভিস ছুটি, ইনস্যুরেন্স, মহার্ঘ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ছুটি প্রভৃতি তাঁরা পাচ্ছেন না। তাঁরা বলেন, ব্রিটিশ সরকার যে মাতৃত্বকালীন ভাতা ও ছুটি প্রদান করত, এখন তা-ও দেয়া হয় না।

এদের মাসিক মজুরি কত হওয়া দরকার?

স্বামী-স্ত্রী দুজন, ছেলে-মেয়ে দুজন, বৃদ্ধ মা-বাবা দুজন— মোট ছয়জনের একটি পরিবারের খাবার খরচই লাগে দৈনিক গড়ে ৪০০-৪৫০ টাকা। হিসাবে মাসে ১৩-১৪ হাজার টাকা লাগে ডাল-ভাত খেতেও। ঢাকা শহরে বড় এক রুমের ঘর ভাড়া ৬৫০০-৭০০০ টাকা। আর যদি কর্তৃপক্ষের দেয়া কলোনিতেও থাকে, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ বিল আসে প্রতি মাসে গড়ে ২৫০০ টাকা। দুই সন্তানের লেখাপড়ার খরচ নিম্নে ৩০০০ টাকা। কাপড়চোপড়, জুতা ইত্যাদি খরচ মাসে গড়ে ১০০০ টাকা। চিকিৎসা খরচ মাসিক গড়ে ১৫০০ টাকা। যাতায়াত ও যোগাযোগ মাসিক ১৫০০ টাকা, উৎসব, পূজা-পার্বণ, আপ্যায়ন খরচ গড়ে ২০০০ টাকা। দেখা যায়, মাসে ২৫-৩০ হাজার টাকা লাগে।

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে তারা ৯-১০ হাজার টাকা আয় করে বা উর্ধ্ব ১৬-১৭ হাজার টাকা আয় করে কীভাবে বাঁচে? উত্তর হল, এটাকে বাঁচা বলা হয় না। মানুষ রূপে কতগুলো প্রাণী কম খেয়ে, কম পোশাক পরে অত্যন্ত নোংরা ঘিঞ্জি পরিবেশে কোনভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখছে। অসম্ভব পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য তাদের। পরিবারের সবাই স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, এমনকি বৃদ্ধ মা-বাবাকেও কাজ করতে হচ্ছে। ঈদ, পূজা-পার্বণ বা উৎসব তাদের নেই। নেই কোন বৈচিত্র্য, সারা বছরই এক রকম।

আবাসন

নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্য ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতরা ঘরবসতি সংক্রান্ত গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এমনই একটি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে— বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের গৃহে কামরার সংখ্যা হবে ৫টি, ক্ষত্রিয়দের ৪টি, বৈশ্যদের ৩টি ও শূদ্রদের ২টি। সিটি করপোরেশন ও সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ডোম অথবা মেথরদের জন্য এক কামরা বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করেছিল। তবে বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন তাদের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য যেসব বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করেছে, সেগুলো দুই কামরাবিশিষ্ট। একটি শোবার ঘর, আরেকটি রান্নাঘর।

ঢাকার টিকাটুলী, ধলপুর, দয়াজঞ্জ, সূত্রাপুর, আগারগাঁওসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ১০x১০=১০০ বর্গফুট বা (১০x১২)=১২০

বর্গফুট একটিমাত্র কামরার মধ্যে এদের তিন প্রজন্মের ৯-১০ জন লোককে গাঙ্গাদি করে থাকতে হচ্ছে। এরই মাঝে মেয়ে তার স্বামী নিয়ে এলে মাঝখানে কাপড় বা পর্দা টানিয়ে রাতে ঘুমাতে হচ্ছে। ছেলে তার বউ নিয়ে এলে মাঝখান দিয়ে বেড়া বা পর্দা টানিয়ে রুমটাকে একটু বাড়িয়ে নিয়ে থাকছে অথবা রান্নাঘরে ঘুমাতে হচ্ছে। ১০-১২টি পরিবারের জন্য একটি বাথরুম, একটি টয়লেট। লাইনে দাঁড়িয়ে সারতে হয় গোসল ও টয়লেটের কাজ। দুর্বিষহ জীবনে মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁইটুকু পেয়েছে যে এটাও তাদের ভাগ্য। অনেকেই বাইরে থাকছে। অনেকের ভাগ্যে তা-ও জুটছে না।

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে প্রায় ২২ হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মী কাজ করছে। তাদের বসবাসের জন্য মাত্র ১৩টি কলোনি রয়েছে; যেমন— টিকাটুলী, গণকটুলী, দয়াজঞ্জ, সূত্রাপুর, ধলপুর, নাজিরাবাজার, হাজারীবাগ, মোহাম্মদপুর, আগারগাঁও প্রভৃতি। লোকসংখ্যা ও আয়তনের দিক দিয়ে টিকাটুলী সিটি সুইপার কলোনি সবচেয়ে বড়। এই কলোনিতে কানপুরী ও তেলেগুদের সংখ্যা বেশি। ডোম গোষ্ঠীদের সংখ্যা তেমন চোখে পড়ে না। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে গণকটুলীর সিটি কলোনি। এই কলোনির ছয়টি ছয়তলা ভবনের প্রতিটিতেই ডোমরা বসবাস করছে। এই কলোনির ২০ একর জায়গার মধ্যে ৪-৫ একর স্থানীয় প্রভাবশালী ও মাস্তানরা দখল করে বসে

আছে। তারা এই জায়গায় ঘর তুলে অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে মাদক ব্যবসা। ডোম সম্প্রদায়ের নারীরাসহ পুরো কলোনিরই সুইপার নারী ও কিশোরীদের যৌন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

গোপীবাগ রেলওয়ে কলোনিতে, টঙ্গী রেলওয়ে কলোনিতে, চিটাগাং রোড ও কাঁচপুর সিন্ডিকালি (সড়ক ও জনপথ বিভাগ) কলোনিতে বহুসংখ্যক ডোম গোষ্ঠীর পরিবার বসবাস করে। এসব কলোনিতে প্রতিটি ঘর কাঁচা টিনশেড। অত্যন্ত ঘিঞ্জি পরিবেশে

নির্মিত। একটি রুম আরেকটির সাথে লাগানো। বাতাস চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। গ্রীষ্মকালে বা গরমের দিনে প্রতিটি ঘরের ভেতর এত গরম পড়ে যে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়। বিদ্যুৎ চলে গেলে তো অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। গরম ও মশার উপদ্রবে রুমের ভেতর থাকাই যায় না, ঘুমানো তো দূরের কথা।

তারা জানান, ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যে নিয়মটি চালু করেছে, যে ব্যক্তি ওই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবেন সেই ব্যক্তিই শুধু ঘর বা রুম পাবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তিন পুরুষ ধরে চাকরি করে আসছেন কিন্তু বর্তমানে তাঁর চাকরি নেই, তাঁর ছেলে-মেয়েদেরও চাকরি হয়নি, এখন তিনি যাবেন কোথায়? অথবা তিনি কর্মরত আছেন, তাঁর ছেলে-মেয়েদের বিয়েশাদি দিয়েছেন, কিন্তু বেকার; তারাও বাধ্য হয়ে থাকছেন— এমতাবস্থায় ছেলে-মেয়েদের থাকতে না দিলে তারা যাবে কোথায়? আলাদা ঘর ভাড়া করার সামর্থ্য তাদের নেই।

ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় সিটি করপোরেশনের জায়গা দখল করে আছে প্রভাবশালীরা। তেমনি রেলওয়ে এবং সড়ক ও জনপথের জায়গাও। অথচ বেশিরভাগ সুইপারকে খুব কষ্ট করে থাকতে হচ্ছে— প্রভাবশালীদের দখলে থাকা জায়গায় নির্মিত ঘরগুলোতে ভাড়া দিয়ে। এই সংকট নিরসনে কর্তৃপক্ষকে আসতে হবে।

উচ্ছেদ আতঙ্ক

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান সরকার তাদের যেভাবে থাকতে দিয়েছিল এখনও তারা সেইভাবে থাকছে। যে যেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে আসছে, সে সেই প্রতিষ্ঠানের জায়গায় নির্মিত ঘরে থাকছে। এখন কথা হল, তারা থাকছে চাকরি সূত্রে, জায়গার কোন বন্দোবস্ত দলিল বা অন্য কোন ডকুমেন্ট তাদের কাছে নেই। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন- ঢাকা সিটি করপোরেশন পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে- এই ব্যবস্থাকে অনেকটা স্থায়ী বলা যায়। আবার রেলওয়ে এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের হাজার হাজার একর ভূমি প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতারা দখল করে রাখলেও তাদের উচ্ছেদ করার মুরোদ তাদের না থাকলেও গরিব বস্তিবাসী ও সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীদের তারা উচ্ছেদ করে থাকে। এর আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে অনেক ডোম ও মেথরকে উচ্ছেদ করে দেয়। এখন উচ্ছেদ করার আরেক কৌশল হল সরাসরি উচ্ছেদ না করে বস্তি বা তাদের থাকার ঘরগুলোতে রহস্যজনকভাবে আঙন লাগিয়ে দেয়া, যাতে বার বার তারা বিরক্ত হয়ে জায়গা খালি করে চলে যায়। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে কাঁচপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের জায়গার ওপর ঘর তুলে থাকছে ডোম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা। কিছুদিন আগে তাদের থাকার ঘরগুলোতে রহস্যজনকভাবে আঙন লাগানো হয়। এতে তাদের প্রায় এক শ ঘর পুড়ে যায়, ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা।

এখানে বলা দরকার, সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এরা চাকরি করছে আর সরকারি জায়গায় থাকছে ও ঘুমাচ্ছে। নিজেদের স্থায়ী কোন বাড়িঘর বা জায়গাজমির কথা কখনও চিন্তাই করেনি, এখনও না। হয়ত বা যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে আসছে, তাদের বাড়িঘর আছে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগ লোক থাকে শহরাঞ্চলে। শহরাঞ্চলে বড়জোর ১০-১২ জনের বাড়ি বা ফ্ল্যাট আছে। অবশিষ্ট কয়েক হাজার লোকের স্থায়ী কোন বাড়ি নেই। এখন তাদের উচ্ছেদ করে দিলে কোথায় গিয়ে থাকবে? ব্যাংকে তেমন জমানো টাকা নেই। ২৫ শতাংশ লোকের ব্যাংকে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা আছে। তারা ছেলে বা মেয়ের বিয়েশাদির জন্য অথবা অন্য কোন বিপদ-আপদের জন্য এই টাকা রেখেছে।

ডোম সম্প্রদায়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক পরিবার-পরিজন নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া থাকছে। যারা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টস ও বিভিন্ন কল-কারখানায় চাকরি করছে, তারাই সবচেয়ে বেশি মানবেতর জীবন যাপন করছে। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বেতন খুবই কম-৫ থেকে ৭ হাজার টাকা। ওভারটাইম করলে আরও দেড়-দুই হাজার টাকা পাওয়া যায়। এই টাকা থেকে ৩-৪ হাজার টাকা ঘরভাড়া দিয়ে দিলে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কীভাবে চলা যায়!

তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, কোন এক সময় তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাড়িঘর ছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বপুরুষদের জোর করে তুলে নিয়ে এসে মেথরের চাকরিতে ও লাশকাটার চাকরিতে নিয়োগ করেছে। আজকে তাদের চাকরিও নেই, থাকার জায়গাও নেই। পূর্বপুরুষদের সেই বাড়ি, জায়গাজমিও বেহাত হয়ে গেছে। দেশের ভেতর বসবাস করেও তারা পরবাসী, উদ্বাস্ত। তাদের সঙ্গে বাঙালিরা, বিশেষ করে শিক্ষিত-মধ্যবিত্তরা এমনভাবে আচরণ করে, যেন তারা ভিখারি, 'অচ্ছত'।

স্বাস্থ্য

এরা যে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে তাতে খুব তাড়াতাড়ি তারা যে কোন সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। প্রবল দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা-আবর্জনা, ধুলাবালি, কাদাপানি নিয়ে কাজ করতে হয় সারাক্ষণ, মাসকে মাস, বছরের পর বছর। কেউ কেউ বলতে পারেন, এসব ময়লা-আবর্জনা নিয়ে কাজ করতে করতে তাদের শরীরে একটা সহ্যক্ষমতা হয়ে গেছে। কিন্তু তারাও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। তাদের শরীরের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। যারা বাসায় বাসায় গিয়ে ময়লা-আবর্জনা টানে, তাদের দেখলে মনে হয়, ২০-২৫ বছরের একজন যুবক যেন ৪০-৫০ বছরের প্রৌঢ়। শরীর-স্বাস্থ্য, চেহারা ভেঙে হাড়গুলো বের হয়ে আছে, চোখ গর্তের ভেতর ঢুকে গেছে, গায়ের চামড়া খসখসে, ফ্যাকাসে, টিলাঢালা।

সূর্য উঠার ৩-৪ ঘণ্টা আগে, রাত ৩-৪টায় তাদের কাজ শুরু হয়, দিনের ১০-১১টায় কাজ শেষ হয়। বেশিরভাগ লোকই আরেকটি কাজ করে। নতুবা সংসার চলবে কীভাবে? তাই কাজ থেকে ফিরে এসে গোসল সেরে নাকে-মুখে চারটা ভাত গুঁজে দিয়ে হালকা বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজে বের হয়ে পড়ে। কেউ রিকশা নিয়ে, কেউ দিনমজুরি করতে বা অন্য কাজে। শরীরের সুস্থতার জন্য যে বিশ্রামটুকু প্রয়োজন

মেথর বলতে ডোম, ডোমার, মঘাইয়া ডোম, হেলা, বাঁশফোঁড়, লালবেগী, রাউত, বাল্লীকি, তেলেগুদের বোঝানো হত। বর্তমানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে বাঙালি মুসলিমদের সংখ্যাই বেশি। তাই শব্দগতভাবেই শুধু নয়, গঠনগতভাবেও মেথর ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মধ্যে পার্থক্য আছে।

তা তাদের হচ্ছে না। কোন শুক্রবার বা সাপ্তাহিক ছুটি নেই। সারা বছরই খাটতে হয়। রাতের বেলা কোন কোন সময় বিদ্যুৎ থাকে না বা ক্ষীণ আলোতে কাচের টুকরা, সুঁই, ধাতব দণ্ড অনেক সময় চোখে পড়ে না। অসতর্কতামূলক ঝাড়ু দিতে গেলে বা ময়লার স্তুপ সরাতে গেলে হাতে সুঁই বিধে যায় বা কেটে যায়। রাতের বেলা মহাসড়কগুলোতে যানবাহন দ্রুতগতিতে চলে। যারা রাস্তায় ঝাড়ু দেয়, তারা কখনও কখনও বেখায়ালি হয়ে পড়ে বা খেয়াল হারিয়ে ফেলে, তখন তারা দুর্ঘটনায় আহত হয়, কোন কোন সময় মারাও যায়।

তারা যে ধরনের বাসায় থাকে- অপ্রশস্ত অপরিসর, স্যাঁতসেঁতে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত। এসব ঘরে বসবাস করলে একজন সুস্থ-সবল মানুষও অসুস্থ হয়ে যাবে। তারা যে পরিশ্রম করে, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, তার জন্য তাদের ২৭০০ থেকে ৩০০০ ক্যালরিয়ুক্ত সুষ্ম-পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদির দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরিয়ুক্ত খাবার তারা খেতে পারছে না। চাল কিনলেই টাকা আর থাকে না। প্রোটিনজাতীয় খাবার তো আরও দামি। কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিনজাতীয় খাবার না খেলে শরীর ঠিক রাখা যায় না। হচ্ছেও তা-ই। এসব কারণে তারা ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ে। শ্বাসটান, সর্দিকাশি, হাঁপানি, ম্যালেরিয়া, বাতজ্বর, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় সময়ই ভুগতে থাকে। মারাত্মকভাবে অসুস্থ হলে সরকারি হাসপাতালের দিকে ছোট্টে। টাকার অভাবে ডাক্তার দেখাতে পারে না বা ওষুধ কিনে খেতে পারে না অনেকেই।

ডোম সম্প্রদায়সহ অন্যান্য ঝাড়ুদার শ্রেণির লোকদের স্বাস্থ্যসেবার কথা বিবেচনা করে সরকারের দরকার ছিল তাদের বসতির কাছে হাসপাতাল স্থাপন করা। তাদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা দেয়া। তাদের

জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করা। জরুরি চিকিৎসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা।

শিক্ষা বিস্তার

ব্রিটিশ সরকার তাদের এমন একটা ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে আটকে রেখেছিল, তাদের কাছে জীবনটা ছিল—‘কাজ করো, খাও’। সারাক্ষণ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকত তাদের পূর্বপুরুষরা। শিক্ষার মত আবশ্যিক প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা তারা মনেই করত না, শিক্ষার প্রতি অনীহা তাদের তখন থেকে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা তাদের জন্য ধর্মপাঠ ও শিক্ষাদীক্ষায় নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছিল। তাছাড়া তাদের নিচু গোত্রের বলে, ‘অচ্ছত’ বলে উচ্চবর্ণের লোকেরা ঘৃণা করত। এতে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা জন্মে, শিক্ষার প্রতি তাদের অনাগ্রহের এটাও একটা কারণ।

কালক্রমে তাদের ভেতর পরিবর্তন আসতে থাকে। আস্তে আস্তে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে তারা। ডোম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কলোনিতে ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিটি ডোম পরিবারই শিক্ষার প্রতি এখন সচেতন। তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে। কথা হল, যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে বাচ্চাদের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার দরকার ছিল। যার ফলে তাদের বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর আর স্কুলে যাচ্ছে না। কিছুসংখ্যক ছেলে-মেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পর অনেকেই ঝরে পড়ে। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরকেন্দ্রিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতেই লাগে দেড়-দুই হাজার টাকা। প্রতি মাসে টিউশন ফি ২০০-৩০০ টাকা, কোচিং খরচ ১০০০-২০০০ টাকা। গাইড বই, নোট বই কিনতে হয়, খাতা-কলমসহ বিভিন্ন খরচ তো আছেই। এটা তো গেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটা হিসাব; কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে শিক্ষা ব্যয় আরও বেশি।

এই খরচ তো দেখানো হয়েছে সাধারণ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর। ঢাকার নামি-দামি স্কুল বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে এদের সন্তানদের পড়ানো সম্ভব নয়। একটি ডোম সম্প্রদায়ের পরিবার কত টাকা আয় করতে পারে—বড়জোর ১৫-১৬ হাজার টাকা, এদের সংখ্যা বড়জোর ৩০ শতাংশ। ৭০ শতাংশ পরিবারেরই আয় ১২ হাজার টাকার নিচে, ৫-৬ হাজার টাকা আয় করে এমন পরিবারও আছে। এখন তাদের পক্ষে ছেলে-মেয়েদের পড়ানো, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে যে খরচ হবে তা জোগাড় করা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাদের পক্ষে।

ধলপুর, গোপীবাগ ও টিকাটুলীতে এদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে এনজিওগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। কয়েক বছর তারা অর্থায়নও করেছিল। কিন্তু বর্তমানে এনজিওগুলো অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে তারা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে স্কুলগুলো চালিয়ে যাচ্ছে। আপাতত পাঠদান চললেও যে ধরনের দক্ষ শিক্ষকের দরকার আছে এবং যতজন শিক্ষক আবশ্যিক, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন সুযোগ থাকার দরকার আছে—তা

নেই। পিছিয়ে পড়া এই ‘দলিত’ শ্রেণির লোকদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের একটা ভূমিকা থাকার দরকার আছে। কিন্তু সরকার শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক কিছু করেছে, এমন কথা বলে গলা ফাটালেও এই দলিত শ্রেণির জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য দান-অনুদান দিচ্ছে না, স্কুল-কলেজ ও প্রতিষ্ঠান করছে না। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকা শহরের ছেলে-মেয়েদের ৫ শতাংশও উপবৃত্তি পাচ্ছে না।

ঢাকা শহরসহ বেশিরভাগ শহরাঞ্চলে লোকজন বিচ্ছিন্ন, কেউ কাউকে চেনে না। তাই এদের ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে অস্পৃশ্য বা অচ্ছত বলে অন্য শিক্ষার্থীরা এড়িয়ে যায় না। এই সমস্যা কিছুটা গ্রামে ও পৌরসভাগুলোতে আছে। তবে দিন দিন এই প্রবণতা কমে আসছে। আগে এদের ছেলে-মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুটা অগোছালো ছিল, যথেষ্ট পরিপাটি ছিল না। বর্তমানে এই সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারছে তারা। মেধার দিক দিয়ে এরা এখনও পিছিয়ে। এই পিছিয়ে থাকার মূল কারণ অর্থনৈতিক, বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণ পাঠদানে যথেষ্ট যত্নবান হন না। তাঁরা প্রাইভেট বা কোচিং পড়ান; এদের ছেলে-মেয়েরা প্রাইভেট বা কোচিংয়ে পড়তে পারে না।

নারীসমাজ

ডোম সম্প্রদায়ের নারীরা যথেষ্ট পরিশ্রমী। প্রায় ৮০ শতাংশ স্ত্রীই চাকরি করে। চাকরি শেষে তারা বাসাবাড়িতে ফিরে এসে সংসারের কাজ শুরু করে। রান্নাবান্না, থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিল পরিষ্কার করে। ঘর মোছে, ঝাড়ু দেয়, বাচ্চাদের সামলায়। তার পরে ঘরের স্বামী, ছেলে-মেয়ে-সবাইকে খাবার দেয়, নিজে খাবার খায়। অনেকেই আবার বাজারও করে। পরিবারের সদস্যরা কেউ অসুস্থ হলে তার খোঁজখবর নেয় এবং সেবা-শুশ্রূষা করে। মোটকথা, ডোম সম্প্রদায়ের নারীরা

খুব কম সময়ই বিশ্রাম নিতে পারে।

দেখা যায়, ডোম পুরুষরা সন্তানদের যত্ন তেমন করে না, সংসারে গৃহস্থালি কাজও কম করে থাকে। আগে তো পুরুষরা মদ খেয়ে ‘বুদ’ হয়ে থাকত কিংবা স্ত্রীদের নির্যাতন করত। সন্তানদের লালন-পালন করা, পোশাক-পরিচ্ছদ গুছিয়ে রাখা, স্কুলে পাঠানো—সবই তাদের স্ত্রীরাই করে থাকে। নিজেরা আয় করলেও আয় করা টাকা তারা নিজের কাছে রাখে না। সংসারে প্রয়োজনীয় খরচ করে, সবার জন্যই কেনাকাটা করে; নিজের জন্য অতিরিক্ত কিছু কেনে না বা দাবিও করে না। বেতন পেলে অনেক সময় স্বামীর হাতে তুলে দেয়।

পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ডোম নারীদের মতামতকে গুরুত্ব কম দেয়া হয়। বিশেষাধিতে পরিবারের প্রধান স্বামীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোন বিষয়ে দ্বিমত থাকলে তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না সাধারণত। তবে আজকাল স্ত্রীদের অগ্রাহ্য করার ধারণা অনেক পাল্টেছে। নারীদের, বিশেষ করে সন্তানদের বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে মতামত চাওয়া হয়।

পঞ্চগয়েত কমিটিতে নারীদের সদস্য হিসেবে রাখা হয় না। সভা-সমিতিতেও তাদের ডাকা হয় না। সালিস-বৈঠকেও তাদের

মতামত নেয়া হয় না। তবে বর্তমানে অনেক ঘটনায় ডোম নারীরা উপস্থিত থাকে, মতামত দিয়ে থাকে। যেমন- বিদ্যালয়ে অভিভাবক ফোরামে, হেলথ ইস্যুতে, বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে; যদিও পুরুষরা প্রধান থাকে।

বিয়েতে যৌতুকের প্রচলন আগে থাকলেও বর্তমানে যৌতুক নেয়া হয় না। তবে কোন কনের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন বরকে কোন জিনিস উপহারস্বরূপ দিলে ভিন্ন কথা। নতুন করে সংসার করতে গেলে অনেক কিছুই দরকার হয়। সেই হিসাব করে যদি মেয়ের মা-বাবা অথবা অভিভাবকপক্ষের সামর্থ্য থাকে, তাহলে কোন অর্থ দিলে সেটা যৌতুক হিসেবে ধরা হয় না।

সাধারণত তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয় না। কিন্তু কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে মেয়ের বয়স অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদি মেয়ের বয়স কম থাকে, তাহলে বিয়েতে মেয়েপক্ষের যত টাকা খরচ হয়েছে, তা হিসাব করে মেয়েকে দেয়া হয়। অথবা মেয়ের পুনরায় বিয়ের খরচ অনুমান করে ছেলেকে দিতে হয়।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ডোম নারীদের পরস্পরের মধ্যে একটা হৃদয়তা আছে, বিপদে-আপদে সহমর্মিতা দেখাতে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে। যেমন-গত বছর টাম্পাকো ফয়েল লি. কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ও ভবনধসে রাজেশ ডোম নিখোঁজ (পরে মৃতদেহ পাওয়া গেছে) হলে ঢাকা মেডিক্যাল দুই শতাধিক ডোম নারী-পুরুষ ছুটে আসে। এর মধ্যে প্রায় দেড় শ হবে ডোম নারী। কিন্তু বাঙালি শ্রমিক নিখোঁজ হলে বড়জোর ৭-৮ জন আত্মীয়-স্বজন মেডিক্যাল এসেছে। এই দেড় শ ডোম নারী সবাই এক জায়গা থেকে আসেনি। কেউ এসেছে টঙ্গী থেকে, কেউ গোপীবাগ থেকে, কেউ গণকটুলী থেকে; এইভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল। পূজা-অর্চনা করার মন্দিরে যেতেও তারা দল বেঁধে যায়। বাজারঘাট করার সময়ও একই অবস্থা দেখা গেছে। আবার কোন বিষয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সবাই মিলে এক হয়ে সাহসের সাথে প্রতিবাদ করে। অল্প কিছুদিন আগে টিকটুলীতে ময়লা-আবর্জনা সরানো নিয়ে এলাকার পাতিনেতা ও মাস্তানদের সাথে একটা ঝামেলা হয়। মাস্তানরা প্রথমে হস্তিতম্বি করলেও ডোম নারীরা ১০-১২ জন একযোগে প্রতিবাদ করতেই তারা পিছু হটে। ডোম নারীদের এই সাহসী প্রতিবাদের সাক্ষাৎ পাই আমরা ঔপন্যাসিক শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

সাধারণত শ্রমজীবী মানুষরা যে ধরনের পোশাক পরে থাকে, তারাও একই ধরনের পোশাক পরিধান করে। শার্ট-প্যান্ট বা পাঞ্জাবি পরে পুরুষরা বাইরে বের হয়। কর্মক্ষেত্রে ও ঘরের মধ্যে সাধারণত শার্ট-লুঙ্গি পরে থাকে। তবে চাকরি যারা করে তারা আজকাল শার্ট-প্যান্ট পরে থাকে। বাঙালি নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষদের মত তাদেরও লুঙ্গিই পছন্দ। কাঁধে গামছা রাখে বা মাথায় বা কোমরে গামছা বেঁধে কাজে লাগে।

ডোম নারীদের কাছে এখনও শাড়ি-ব্লাউজই প্রিয়। তারা ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে সব সময় শাড়িই পরে থাকে। বাঙালি মুসলমান নারীরা এখন সালোয়ার-কামিজ বা খ্রিপিঁস পরে থাকে,

বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। কিন্তু ডোম নারীদের মধ্যে এমনটি দেখা যায় না। ডোম মেয়েরা যারা স্কুল-কলেজে পড়ে বা অবিবাহিত, তারাও সালোয়ার কামিজ পরে থাকে। ঘরের বাইরে ঘুরতে বা বেড়াতে গেলে কিংবা বাজারঘাটে যেতেও ঠিক একই শাড়ি পরে বের হয়। কোন অনুষ্ঠানাদি বা উৎসব উপলক্ষে নতুন কাপড়চোপড়, গয়নাগাটি তাদের কিনে দিতে হবে-এমন আবদার তেমন করে না; যদিও পুরুষদের সমান তারাও আয় করে থাকে।

তেমন গয়নাগাটি ব্যবহার করতে দেখা যায় না। আবার বিবাহিত ডোম নারীরা নাক-কান খালিও তেমন রাখে না। সাধারণভাবে নাকফুল, রিং, পাশা প্রভৃতি কমদামি গয়নাই তারা ব্যবহার করে থাকে। হাতে শাঁখা বা চুড়ি পরে। কপালে সিঁদুর ও টিপ দেয়। চোখে কেউ কেউ কাজল দেয়।

বিয়ে

ডোমদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের জন্য আলাদা কোন ঘটক দেয়া হয় না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও চেনা-পরিচিতরাই বর-কনের অভিভাবকের কাছে প্রস্তাব দেয়। হিন্দু রীতিতেই বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাদের নির্ধারিত পুরোহিতই বিয়েতে পৌরোহিত্য করেন। কোন কারণে পুরোহিত না এলে পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কোন বয়স্ক ব্যক্তি বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন। উঠানের মাঝখানে বা ঘরের মাঝখানে একটা বৃত্ত রচনা করে বর-কনে, তাদের কাছের আত্মীয়রা এবং পুরোহিত বসেন। তাদের গায়েহলুদ অনুষ্ঠান ৩ দিন বা ৫ দিন বা ৭ দিন সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেলেও ওই পোশাক পরিধান করে থাকে। বিয়ের পরের ৫ দিনের মাথায় অথবা সপ্তম দিন স্নান সেরে পোশাক পরিবর্তন করে থাকে। ধর্মানুযায়ী কনেকে অবশ্যই নাকফুল দিতে হয় এবং ন্যূনতম স্বর্গের গয়না দিতে হয়। বিয়েতে পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে কনেকে শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট বা ছায়া, জুতা-স্যান্ডেল ইত্যাদি বরপক্ষকে কিনে দিতে হয়। আবার বরের জন্যও কনেপক্ষ নতুন শার্ট-প্যান্ট, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, জুতা-স্যান্ডেল কিনে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠান বেশিরভাগ কনের বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। বিয়েতে কনের আত্মীয়-স্বজন, বরের আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের লোকদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়।

ডোম সামাজ বিয়েশাদিতে জাতপাতের বিষয়টি মেনে চলে। নিজেদের গোত্রের সঙ্গে বিয়েশাদি দেয়া হয়। যদি কোন ছেলে বা মেয়ে ডোমদের বাইরে অন্য জাতের মেয়েকে বা ছেলেকে বিয়ে করে, তাহলে এই বিয়ে ডোম সমাজ মেনে নেয় না। ওই পরিবারটিকে সমাজচ্যুত করা হয় অথবা আর্থিক জরিমানা করা হয়।

ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল

গোপীবাগ রেলওয়ের এক পাশে মসজিদ অন্য পাশে ডোম সম্প্রদায়ের (সুইপারদের) কলোনি। মুসলিরা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে, ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সময় রেললাইনের ওপর বসে থাকে, এতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। জুমাবার নামাজের আগে থেকে ডোমরা রেলের ওপর বসা বন্ধ করে দেয়। একদিন আসরের নামাজের সময় মসজিদের সামনের মাঠে কয়েকটি কিশোর ক্রিকেট খেলছিল, একজন বয়স্ক ব্যক্তি এসে বালকদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি চিৎকার করে

বললেন, 'এখন নামাজের সময়, মুসল্লিরা নামাজ পড়তে আসবে; খেলা বন্ধ করো।'

রমজান মাসের কোন একদিন গোপীবাগ রেলওয়ের সেই কলোনিতে বউভাতের একটা অনুষ্ঠান চলছিল। শতাধিক নিমন্ত্রিত অতিথির মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাদের বসার জন্য চেয়ার বসানো হল। সেই লাইনের পাশে লম্বা করে খালি জায়গাটুকুতে—যে পাশে মসজিদ অবস্থিত। লাইনের অন্য পাশে প্যাভেলের ভেতর নানা বয়সী মেয়েরা বসেছিল। আমরা একে অন্যের সাথে খোশগল্প করছিলাম। একজন বয়স্ক ডোম সতর্ক করে বললেন আস্তে আস্তে কথা বলতে, মসজিদে তারাবির নামাজ হচ্ছে, যাতে তাদের ডিস্টার্ব না হয়। নামাজ শেষ হওয়ার ৫-৬ মিনিট আগেই এদের একজন এসে আমাদের অনুরোধ করে বললেন, আমরা যেন চেয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে রাখি আপাতত, যাতে মুসলিরা নামাজ শেষে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। আমরাও তাই করলাম।

ওই কলোনিতে কয়েকটি মুসলমান পরিবার ভাড়া থাকে। তাদের থেকে জানতে জিজ্ঞেস করলাম, এদের সাথে থাকতে সমস্যা হচ্ছে না? তারা বলল, 'সমস্যা হবে কেন? তারা তাদের ধর্ম পালন করছে, আমরা আমাদের ধর্ম পালন করছি। তারা শুয়োরের মাংস খায়, আমরা গরুর মাংস খাই।'

মুক্তিযুদ্ধে অবদান

পাকিস্তান আমলে আদমজীতে বিহারি-বাঙালি দাঙ্গায় কয়েকজন লোক নিহত হন। পুলিশ এসে লাশ তুলে নিয়ে যায় এবং পোস্টমর্টেম (ময়নাতদন্ত) করার পর লাশগুলো ডোমদের হাতে তুলে দেয়া হয় কবরস্থ করার জন্য। ডোমরা লাশগুলো কবর দিয়ে বাসায় ফিরছিলেন, তারা পরস্পরের সাথে কথা বলছিলেন উর্দুতে। বাঙালিরা মনে করেছিলেন এরা বিহারি, তাই তারা হঠাৎ আক্রমণ করে বসেন—এতে দুজন ডোম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। (সূত্র : মিত্র চান ডোম, সভাপতি, ডোম সমাজ উন্নয়ন কমিটি)।

এইভাবে ভাষা নিয়ে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতায়ুদ্ধেও বার বার সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। কৃষ্ণলাল ডোম বললেন, "যুদ্ধ চলাকালে কাঁচপুর ব্রিজের কাছ থেকে ধরে নিয়ে গেল মাতুয়াইলে, কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহ করেছিল আমরা বিহারি এবং হানাদার বাহিনীর সহযোগী। আমরা ডোম, ধর্মগতভাবে হিন্দু। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত হয়, আমরা ডোম। কমান্ডার আমাদের সহযোগিতা করতে বললেন, বিশেষ করে শত্রুবাহিনীর অবস্থান ও ক্যাম্পের অবস্থা জানিয়ে দিয়ে। এর পর থেকে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের খবরাখবর সরবরাহ করতাম। আমাদের দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মুক্তিযোদ্ধারা হানাদারদের ক্যাম্পে ও অবস্থানে নিখুঁত আক্রমণ চালিয়ে সফল হয়। যেহেতু আমরা টয়লেট পরিষ্কার ও ঝাড়ু দেয়ার জন্য ক্যাম্পের ভেতর ঘোরাঘুরি করতে পারতাম।' এইভাবে সারা দেশেই ডোমরা মুক্তিযোদ্ধাদের কমবেশি সহযোগিতা করে।

১৯৭১ সালে ওই নয় মাসে হানাদার ও রাজাকার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে লাশ ফেলে রাখত। এই লাশগুলো তুলে নিয়ে সৎকার করত ডোমরা। ঢাকায় কাজলা ও শ্যামপুর এলাকায় অনেক মানুষকে ধরে নিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখত। ডোমরা এসব জায়গা থেকে লাশগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মাটিচাপা দিত। পাক হানাদার বাহিনী অনেক সময় ডোমদের ধরে নিয়ে যেত লাশগুলো তুলে নিয়ে মাটিচাপা দিতে।

অপরাধমূলক কাজ ও অসামাজিক কাজে না জড়ানো

সারা দেশে বর্তমানে অপরাধমাত্রা বেড়েই চলেছে। খুন, ধর্ষণ, গুম, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই হরহামেশা হচ্ছে। হিসাবে তুলনামূলকভাবে এসব অপরাধের সাথে ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরা তেমন জড়িত নন। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তারা কোনোভাবেই অপরাধে নিজেদের জড়িয়ে না। মদ তারা বংশপরম্পরায় খেয়ে আসছে। তবে হরিজন ঐক্য পরিষদের দেয়া তথ্য মতে বর্তমানে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বেশিরভাগ লোকই। ৮-১০ শতাংশ লোক মদ খায়। নতুন প্রজন্মের ২ শতাংশও মদ খায় না। কলোনিগুলোতে এসে বাইরের লোক বলতে পাড়ার মাস্তান, রাজনৈতিক পাতিনেতারা এসে খায়; বদনাম হয় ডোম সম্প্রদায়ের।

অস্পৃশ্যতার ছোবল বন্ধ করতে হবে জেমস ওয়াইজ তাঁর 'পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি বর্ণ ও পেশার বিবরণ' গ্রন্থে আজ থেকে প্রায় দেড় শ বছর (১৮৮৩ সাল) পূর্বে ২০০টি বর্ণ ও পেশার বিবরণ উল্লেখ করেছিলেন। এই দেড় শ বছরে দেশের সীমানা ভেঙেছে দুইবার। বিশাল ভারতবর্ষ ভেঙে ১৯৪৭ সালের দিকে হল ভারত ও পাকিস্তান, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে হল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। জেমস বর্ণিত সেই ২০০টি বর্ণ ও পেশার অনেকগুলো বর্ণ ও পেশা

লুপ্ত হয়ে গেছে। পেশার ওপর ভিত্তি করে বর্ণের উদ্ভব হয়েছে। পেশার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। এক বর্ণের লোক মিশে গেছে অন্য বর্ণের সাথে। যেমন—কাহার গোষ্ঠী, তাদের মূল পেশা ছিল পাঙ্কি বওয়া। এখন পাঙ্কির চল একেবারে উঠে গেছে। এই পেশার লোকগুলো গেল কোথায়? নিশ্চয় অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত হয়েছে। শুধু পেশাই হারিয়ে যায়নি, গোত্র পরিচয়ও হারিয়ে গেছে। হরিজন ঐক্য পরিষদের ভাষ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে ৮৬টি দলিত গোষ্ঠী আছে, তবে তাদের অনেকেই পূর্ব পেশায় যুক্ত নেই; যেমন—ভূঁইমালি ও যোগী।

মেথর শ্রেণির লোকেরা বলতে ডোম, ডোমার, মঘাইয়া ডোম, লালবেগী, হাঁড়ি, বাঁশফোঁড় ও হেলা স্বপেশায় এখনও নিয়োজিত আছে। তাদের ওপর শোষণ, নির্যাতন, অস্পৃশ্যতার ছোবল একটুও কমেনি। বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে এদের অবস্থা আরও খারাপ। ভারতে দলিতদের খুন, ধর্ষণ, মারপিট অহরহ করা হয়। বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে অস্পৃশ্যতার ছোবল কিছুটা হলেও কমে আসছে। কেউ কেউ বলেন, এই কমে আসার মূল কারণ হল, নগরায়ণ, নগরের কেউ

কাউকে চেনে না। বাস্তবে এটা মূল কারণ নয়, অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটা একটা। মূল কারণ হল শ্রেণিগত অবস্থান। যেমন-পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যে বাঙালি মুসলমান বলতে গরিব মানুষরাই বেশি। তারা গরিব বলেই এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন। পরস্পরের সঙ্গে কাজ করছেন, বসছেন, গল্প করছেন, চা পান করছেন-এখানে তাদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, ডোম, হাঁড়ি, তেলেগু, বাঙালি-এসব প্রশ্ন উঠছে না।

কিছুদিন আগে ঢাকার গোলাপবাগ এলাকার বউবাজারে ১৪-১৫ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ম্যানহোল পরিষ্কার করছিল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ করলাম, তাদের কেউ বাংলায়, কেউ উর্দুতে, কেউ হিন্দি ও উর্দুমিশ্রিত ভাষায় কথা বলছে। কাজের ফাঁকে হুমায়ুন সাহেবের রেললাইনের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল ও গল্প করছিল।

ধর্ম

যে ১১টি বর্ণ-গোষ্ঠীকে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তার মধ্যে ডোমরা হল শীর্ষে। শুধু জগন্নাথ মন্দির কেন, যে কোন পবিত্র স্থানের ত্রিসীমানায় তাদের পা মাড়ানোও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ফলে তাদের কোন পুরোহিত ছিল না।

যেহেতু তারা বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপে বাস করত না। বৃহৎ মানবসমাজে যেহেতু অধিকাংশ মানুষ হিন্দু। হিন্দুরা পূজা করছে, ব্রাহ্মণদের নৈবেদ্য দান করছে, উপহার দিচ্ছে, তখন তারাও ধীরে ধীরে ধর্মের প্রতি ঝুঁকতে থাকে। বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকার ডোমদের গুরু ছিলেন ভগবৎ। আবার কিছুসংখ্যক ডোম হল হরিশচন্দ্রী অর্থাৎ রাজা হরিশচন্দ্রের অনুসারী। হরিশচন্দ্র নামের এক রাজা নাকি তাঁর সমস্ত অর্থসম্পদ দান করে দিয়ে ডোমদের সঙ্গে থাকতেন। তিনিই সব শ্রেণির ডোমদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেন।

ডোমদের প্রধান পূজা হল শ্রাবণ। শ্রাবণ মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া তারা হিন্দুদের সব পূজাই পালন করে থাকে। সব হিন্দু যেমনভাবে গুরুত্ব দিয়ে দুর্গাপূজা পালন করে থাকে, তারাও সমান গুরুত্ব দিয়েই দুর্গাপূজার উৎসব করে থাকে। মঙ্গল কামনার্থে তারা শীতলপূজা পালন করে থাকে। ফাল্গুন, চৈত্র বা বৈশাখ মাসের শনি বা মঙ্গলবারের যে কোন এক দিন এই পূজা করা হয়। পূজার অনুষ্ঠান উপলক্ষে খিচুড়ি রান্না করে অথবা পায়েশ রান্না করে সিম্মিরূপে তা সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাদের ধারণা, এতে মনের বাসনা-কামনা পূর্ণ হয়। এছাড়াও তারা মন্দিরে গিয়ে আগরবাতি বা ধূপ জ্বালায়, বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে মন্দিরে দেব-দেবীদের পাদদেশে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। তাদের কলোনিগুলোতে কালীমন্দিরের আধিক্য চোখে পড়ে। টিকাটুলী কলোনিতে একটি শিবমন্দির ও একটি রামমন্দির রয়েছে।

খাবার : ডোমরা হাঁস-মুরগি ও শূকরের মাংস খেলেও গরুর মাংস খায় না। তবে বর্তমানে অনেক ডোমই মুসলমানদের বাড়িতে খাবার খায় এবং মুসলমানদের বাড়িতে অনেকেই গরুর মাংসও খায়। আসামে ডোমরা মহিষের মাংস খায়। মাছ সব শ্রেণির ডোমরাই খায়। সাধারণ বাঙালিদের মত তাদেরও খাদ্য ভাত, মাছ, শাকসবজি ও ডাল। অনেকেই সকালে নাশতা, রুটি বা পরোটা খায়। বিকেলে চা-বিস্কুট খায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : কেউ মারা গেলে সাধারণত শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। তবে বাচ্চাদের সাধারণত গর্ত খুঁড়ে কবর দেয়া হয়। বয়স্ক কোন লোক মারা গেলে ১৩ দিনের মাথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করা হয়। আবার এক মাস পরেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শূকরের মাংস, হাঁস ও মুরগির মাংস পরিবেশন করা হয়। এই ১৩ দিন মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, স্ত্রী বা স্বামীকে অশৌচ থাকতে হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিনই স্নান করতে পারবে। আবার এক মাস পর্যন্তও অশৌচ অবস্থায় থাকতে পারে। খাবার হিসেবে বিভিন্ন ফল, চিড়া-মুড়ি খেতে পারবে।

ভাষা : তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় মাতৃভাষা উর্দু ও হিন্দিমিশ্রিত ভাষায় কথা বলে। আর যখন বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলে তখন বাংলা ভাষায় কথা বলে। স্কুল-কলেজে সাধারণত বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করে। তবে তাদের মাতৃভাষা 'জাবাল'পুরীর কোন বর্ণ বা অক্ষর নেই, শুধু কথ্য ভাষা। ভারতে লেখালেখির কাজে ডোমাররা হিন্দি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। আবার মধ্যইয়া ডোমরা সব সময় বাংলা ভাষায় কথা বলে ও লেখাপড়া করে থাকে।

'ডোম সমাজ উন্নয়ন কমিটি'

ডোমদের কিছু দাবি তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে এই সংগঠনটি গঠন করা হয়। এটি একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন কমল লাল ডোম ও বিনয় লাল ডোম। তবে এই কমিটি ছিল পকেট কমিটি-অনির্বাচিত। কমিটির যাঁরা সদস্য তাঁরা মাঝেমধ্যে বসতেন। কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। সংগঠনের আয়-ব্যয়ও হিসাব রাখা হত না। ডোম সমাজের উন্নয়নের জন্য তেমন কাজও তারা করত না। তরুণরা এগিয়ে এসে কমিটি ভেঙে দিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করার দাবি জানায়। অবশেষে

২০১৪ সালের শেষ দিকে কমিটি ভেঙে দেয়া হয়, নতুন কমিটি গঠন করার তারিখ ঘোষিত হয়। বর্তমানে কমিটির সদস্যসংখ্যা ৩১, সভাপতি মিঠুন চান ডোম (ফতুলা), মহাসচিব শরমন লাল ডোম (হাজারীবাগ), সাংগঠনিক সম্পাদক দিলীপ ডোম (টঙ্গী), অর্থ সম্পাদক নয়ন লাল ডোম (গোপীবাগ, ঢাকা)। এই কমিটি দেশের ৬৪টি জেলার যেখানে ডোম আছে, প্রতিটি জেলা থেকে ৩ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে।

এই কমিটি গঠিত হওয়ার পর একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হয়। ডোমদের কল্যাণে নৌমস্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। কাঁচপুরে মেথরদের কলোনিতে আগুন লাগলে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়। গত বছর টাম্পাকো ফয়েলস লি. কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডে ভবনধসে রাজেশ ডোম নিহত হলে নিহত পরিবারের প্রতি সহযোগিতা ও সমবেদনার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। গত বছর ৪ সেপ্টেম্বর ডোম সমাজ উন্নয়ন কমিটি ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যৌথ সভায় টঙ্গীতে রাজেশ ডোমের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের শাস্তি ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়।

হরিজন ঐক্য পরিষদ

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ একটি অরাজনৈতিক সামাজিক

সংগঠন। হরিজন সম্প্রদায়ের কিছু মৌলিক অধিকার ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ হরিজন ফেডারেশন, বাংলাদেশ সংযুক্ত হরিজন সমিতি, বাংলাদেশ বাঁশফোঁড় হরিজন ঐক্য পরিষদ এবং বাংলাদেশ হেলা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা-এই চারটি হরিজন সংগঠনের সমন্বয়ে ১৯৯৮ সালে হরিজন ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়েছিল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম-কেন 'হরিজন' নাম রাখা হল? অথবা 'হরিজন ঐক্য পরিষদ' নাম না দিয়ে দলিত ঐক্য পরিষদও তো রাখা যেত। এই প্রশ্নের উত্তরে হরিজন ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেন, বাংলাদেশে হরিজন আমরা যাদের বলে থাকি, তারা সকল বর্ণ বা গোত্রের নিচে, দলিতদেরও দলিত। অর্থাৎ অন্যান্য 'দলিত' গোষ্ঠীও এদের বিবেচনা করে, 'অচ্ছত' ভাবে। তাছাড়া দলিতদের বিভিন্ন সংগঠন আছে। তাই অন্যান্য দলিত গোষ্ঠী থেকে এদের আলাদা করার জন্যই আমরা এই সংগঠনের নাম হরিজন ঐক্য পরিষদ রাখি। হরিজন শব্দটি বাংলাদেশ সরকারেরও পছন্দ।

যে কোন সংগঠনের নাম, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং কর্মসূচি ওই সংগঠনের নিজস্ব ব্যাপার। তবু শব্দটির ব্যাপারে আপত্তি থাকায় আমি বললাম, শব্দটির যে অর্থ, গান্ধীর হরিজনরা সেই অর্থে নয়। তাঁরাও বলেন, ভারতে প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক 'দলিত' সম্প্রদায়ের, এদের ভোট ব্যাংক দখল করার ও সংস্কারমূলক কর্মসূচি দিয়ে তাদের প্রকৃত অবস্থা থেকে বের করে না নিয়ে আসার উদ্দেশ্যেই এই নামটি দেন গান্ধী।

হরিজন শব্দটির অর্থ হলো ঈশ্বরের সন্তান। এখন বলতে হয়, অন্য মানুষরা কি ঈশ্বরের সন্তান নয়? খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঈশ্বরের সন্তান বলতে বোঝে মা মেরির গর্ভে জন্ম নেয়া। পতিতালয়ে জন্মাভ করা পিতৃপরিচয়হীন শিশুকেও বলা হয় ঈশ্বরের পুত্র বা চিলড্রেন অব হ্যাভেন। যশোর শহরে মাড়োয়ারি মন্দির পতিতালয়ে মাড়োয়ারি চিলড্রেন অব হ্যাভেন নামে একটি শিশু আশ্রয় কেন্দ্র একটি বিদেশি এনজিও চালায়। ডোমরা যে কাজ করে, যে সমাজে বসবাস করে, সেই সমাজের লোকেরা তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলে মর্যাদা দেয়? না, আসল কথা হল, ডোম সমাজে আন্দোলন-সংগ্রাম করে মর্যাদা লাভ করতে হবে।

তবু 'দলিত' এই বর্ণ-গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে হরিজন ঐক্য পরিষদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যেমন-(১) চাকরিতে এদের নিয়োগ ও স্থায়ীকরণ (২) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এদের জন্য ৮০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ করা (৩) হরিজন সম্প্রদায়ের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের আওতায় এনে তাদেরকে বয়স্ক ভাতা প্রদান (৪)

হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সংক্রান্ত ও বৈষম্য বিলোপ সাধনে আইন প্রণয়ন (৫) হরিজন সম্প্রদায়ের মানবতের আবাসন উন্নয়ন-এই পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরিজন ঐক্য পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে আসছে।

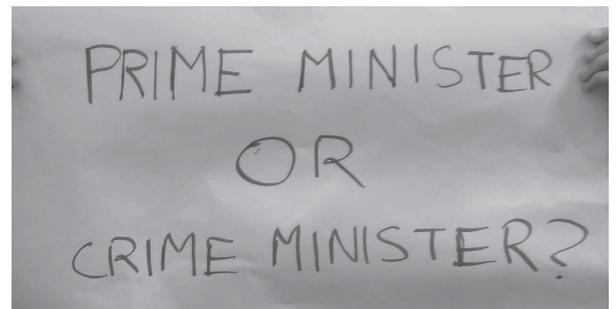
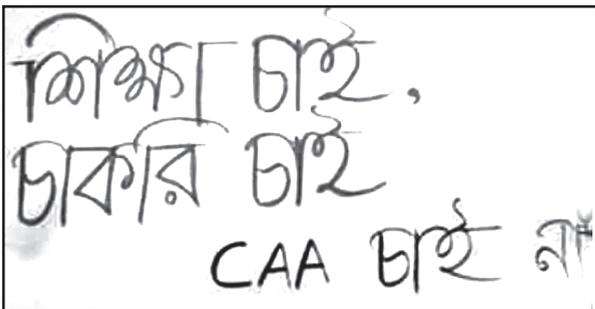
হরিজন ঐক্য পরিষদ জানায়, বাংলাদেশের ৫৬টি জেলায় এবং ঢাকার ৩টি থানায় তাদের কার্যালয় চালু আছে। সারা দেশে তাদের ১৫ লাখ লোক রয়েছে। মোট ৮টি বর্ণ-গোষ্ঠীর লোক-(১) ডোম (২) ডোমার (৩) হেলা (৪) হাঁড়ি (৫) রাউত (৬) বাঁশফোঁড় (৭) লালবেগী ও (৮) বাল্লীকি নিয়ে এই সংগঠনের কাজ।

দলিতদের মহান নেতা ড. আম্বেদকর

ভারতীয় উপমহাদেশে যে অমানবিক বর্ণভেদ প্রথা গড়ে উঠেছে, এই বর্ণভেদ প্রথা ভাঙতে ও বর্ণবৈষম্য দূর করতে এবং দলিতদের অধিকার আদায়ে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন যে মানুষটি তাঁর পুরো নাম ভিমরাও রামজি আম্বেদকর। তবে তিনি বাবাসাহেব নামে ভারতের সর্বত্র পরিচিত। দলিত সম্প্রদায়ের কাছে দেবতুল্য এই মানুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক মুচির ঘরে। বর্ণভেদ প্রথার জ্বালা তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় তাঁকে উচ্চবর্ণের সহপাঠীদের সঙ্গে বসতে দেয়া হত না। তাঁকে বসতে দেয়া হত বারান্দায় চট বা বস্তা বিছিয়ে। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে মাহাদে সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্বদানের মাধ্যমে তাঁর সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। জলাশয়ে জল আনতে গেলে দলিতদের বাধা দেয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। তারই প্রতিবাদে তিনি শুরু করেন 'সত্যগ্রহ' আন্দোলন। এইভাবে দলিতদের অধিকার আদায়ে ব্যাপক সংগ্রাম শুরু করেন তিনি। ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। দলিতদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন, কিছু কিছু সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভও করেছেন। শেষে তিনি প্রায় ৫০ হাজার অনুসারী নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতের দলিত সম্প্রদায় আম্বেদকরকে মহাত্মা গান্ধীর বদলে প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি জানিয়ে আসছে সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোর মাধ্যমে।

আবদুস সাভার : লেখক, গবেষক। নলাম, সাভার (গণবিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে)

মোবাইল : ০১৮৮৪৬২০৭৩৩



ফেসবুক থেকে সংগৃহীত